PARTHASARATHI : RNI 5158/ 60: print format converted to web-magazine since 24.04.2020 during Nationwide Lockdown.
Mail id: info@parthasarathipatrika.com

## সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক |
|---|---|
| প্রীতি-কণা | শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ |
| পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার | শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ |
| জ্ঞানের মূলতত্ত্ব | শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় |
| লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অলৌকিকত্ব | ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য |
| একটা মৃত্যুর পর | সুনন্দন ঘোষ |


পঞ্চম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই ভাদ্র, ১৪২৭ / ২৪.০৪.২০২০

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

## প্রীতি-কণা

"মুখেই বলি নির্ভরতা আছে, বিশ্বাস আছে, আসলে এর কোনটাই নেই। আমরা সর্বদা সংশয় ও দ্বন্দ্বে ভুগি, আর সেইজন্যই যেমন সাফল্য নেই, তেমনই জীবনে সুখ-শান্তিও নেই।"



ভূমিকা: এবারকার চিঠিগুলি শ্রী প্রীতিকুমারের বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত থেকে। তিনি একটি চিঠি আমার বাবা স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ বসুকে লিখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে তাঁর নিজের বিয়ের ব্যবস্থাপনা তাঁকেই করতে হয়েছিলো। বাকি ২টি চিঠি ঐ সময়ে আমাকে লেখা। এখানে তাঁর প্রেমময় সত্তার কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে।

* * *

কলিকাতা
২১শে বৈশাখ, ১৩৬৩

শ্রীচরণকমলেষু,

আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী গায়ে হলুদের হলুদ মেয়েদের পাঠান হয় না। আমাদের দেশের প্রথা, ছেলেপক্ষ বাসী বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রথানুযায়ী হলুদ পাঠান হয় এবং সেই সঙ্গে অন্য সকল আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি পাঠানো হইয়া থাকে। আমাদের দেশের প্রথা যে, ছেলের গায়ে হলুদের সময় এবং আভ্যুদয়িকের সময় কন্যাপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং সেইমত কন্যাপক্ষ তাহাদের গায়ে হলুদ ও অন্যান্য করণীয় কাজ করেন। আমরা যখন আমাদের দেশের প্রথানুযায়ী বিবাহ করিতেছি তখন সেইমত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমার অন্যান্য বোনেদের দূরে বিবাহ হইয়াছিল। তাহাদেরও ঐ প্রথানুযায়ী বিবাহ হইয়াছিল। আমার যতটুকু মনে আছে তাহাতে মনে হয় বেলার বিবাহের সময় এই প্রথা অনুসরণ করা হইয়াছিল। সেই ঘরেই যখন বিবাহ হইতেছে তখন ঐ প্রথা অনুযায়ীই কাজ হইলে ভাল হয়। কারণ নূতন করিয়া হলুদ পাঠান অসুবিধা।

নিম্নে গায়ে হলুদের এবং আভ্যুদয়িকের সময় দিয়া দিলাম। আপনারা সেই অনুযায়ী কাজ করিবেন।
গাত্রহরিদ্রা – বেলা ৯ ঘটিকার মধ্যে,
আভ্যুদয়িক – বেলা সাড়ে ১০ ঘটিকায়।

প্রণাম জানিবেন।

ইতি

আপনাদের
প্রীতিকুমার

*****

ওঁমা

৩/৩/৫৫

শ্বেতা,

পাগল আর কাকে বলে! সমস্ত পাগলামি ছাড়, আপন কাজ কর। অতীত কে ভুলে যাও। অতীতকে ততটুকু মনে রাখবে যতটুকু ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়বার জন্য দরকার হয়। শুধু এগিয়ে যেতে হবে এই কথা সর্বদা মনে রাখবে। ভগবৎ কৃপা, ভগবৎ প্রেম এককণাও পেলে সমস্ত জীবনের পাপ মুছে যায়। ভিতরে ভিতরে বাজে স্বপ্নের জাল বুনে কেন নিজে কষ্ট পাও?

তুমি বিশ্বাস কর, আমি শপথ করে বলছি, যতদিন আমি মায়ের চরণাশ্রিত হয়ে থাকবো, ততদিন কোন পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। লোকে যে যাই বলুক, ভগবান তোমার উপর বিরূপ হবেন না। --- একবার বম্বে গিয়েছিলে মনে আছে কি তোমার? নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখেছো? দেখ সমুদ্রে সমস্ত নদীর জল এসে মেশে, কিন্তু সমুদ্রের বাড়া কমা বোঝা যায় না।

আমি যোগী বা সাধক না হলেও আমার ভিতরের মন ও প্রাণে দুঃখে বা আনন্দে বাড়া কমা আজ আর নেই। তোমার কোন কর্মধারায় আমি ব্যথা পাবো বা ঘৃণা করব এমন চিন্তা তোমাকে কেমন করে স্পর্শ কোরল? তোমার লিখতে হাত কাঁপল না? তুমি শুধু এই কথাই সর্বদা স্মরণ রাখবে কোনও নারীকেই আমি ঘৃণার চোখে দেখি না, তা সে জগতের কাছে ও সমাজের কাছে যত ছোটই হোক। দেখ মানুষ সমস্ত জীবনভর যা করে, সে কথা সে ভুলে যায় – ধাপে ধাপে যত সে ওঠে। ততটুকু তার মনে থাকে, যতটুকু বিরাট সমস্যা হয়ে চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। তাই নয় কি?

যারা যোগী বা সাধক তাদের নিকট একনজরে জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মতো ভেসে ওঠে। তাই তোমাকে বলি আমি যোগী বা সাধক না হলেও আমি মায়ের প্রিয় সন্তান বলে আমার হৃদয়ে অন্যের ব্যথা বেজে ওঠে বা চোখে ধরা পড়ে।

আমার এ আঁখি কথা কয় না – শুধু দেখে ও হাসে আর হৃদয় দিয়ে করে হৃদয়ের উপলব্ধি। তাই বলছিলাম যা তুমি জানিয়েছ তার লক্ষ গুণ বেশি আমি জানি। আর জানি বলেই সমস্তকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছি, যাতে সেখানে শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। নারী ভগবতী শক্তির অংশ। তাই ক্ষেত্র বিশেষে তুমি পূজ্য ও ভালোবাসার পাত্র।

তুমি যদি মনে কর ভুলবশতঃ বা জ্ঞানতঃ অন্যায় করেছ বা করছ, অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্পণ কোরো আমার উপর। জগতের সমস্ত পাপ বহন করার শক্তি ভগবান আমাকে দেবেন। আমি যে তাঁর একান্ত প্রিয়।

তোমার যে বন্ধু তোমাকে সমস্ত জানাবার জন্য বলেছিল তাকে আমার নমস্কার জানাবে। বোল প্রকৃত বন্ধু যে, সেই আলোর সন্ধান দেয়। অনেক কথাই লিখলাম, সব হয়তো তোমার ভাল লাগবে না।---

DO NOT COPY

আমি বেশ অসুস্থ বোধ করছি। রাত্রে কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না। মনে হচ্ছে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ীতেই চুপচাপ বসে দিন কাটাচ্ছি। হিসাবের খাতায় ওপারের ডাক এসেছে মনে হয়।

আবার তোমায় বলি ভাল হতে হলে যুগ যুগ, জন্ম জন্ম সাধনা করতে হয় – খারাপ হতে বা নীচে নামতে ক্ষণিকের ইচ্ছাই যথেষ্ট।

শেষবার বলি তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করলাম। ভগবৎ চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলাম। তুমি নিশ্চিন্তে তোমার ইচ্ছামত চলতে পার।

ইতি
মাতৃচরণাশ্রিত
শ্রী প্রীতিকুমার

*****

১৪/৩

প্রিয় শ্বেতা,

বিদায়ের ক্ষণ সবক্ষেত্রে বেদনার তাতে সন্দেহ নেই। বেদনা থাকলেও তার ভিতর থাকে আশা, পুনর্মিলনের সুখ, বিরহের আনন্দ। অপেক্ষা করবার সুখ ও আনন্দই কি কম?

তোমাকে শক্তিগড় রাঁচী পৌঁছাতে গিয়েছিলাম। ব্যথা পেয়েছিলাম অস্বীকার করা যায় না। হতাশও অবশ্য হয়েছিলাম। কিন্তু তার ভিতর ছিল আমার উচ্চ আশা। তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে যাচ্ছ। শিক্ষা ও সঞ্চয় যখন শেষ হবে তখন কত আনন্দ নিয়ে ফিরে আসবে। তুমি আমায় বলবে, "দেখ, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য, দেশের জন্য, নিজের জীবনকে সুন্দর ও শৃঙ্খলামণ্ডিত করবার কত সম্পদ এনেছি। এমন জিনিস এনেছি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। অথচ সকলকে দেবার মধ্যেই এর তৃপ্তি।" আরও কত জয়ের মালা নিয়ে আসে এই আসা যাওয়ার ভিতর দিয়ে। তা আনে, যে প্রিয়জনকে ক্ষণেক ব্যথা দিয়ে চলে যায় তারই জন্য।

আমরা অবুঝ, বুঝেও বুঝি না, তাই ব্যথা পাই বেশী।

একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আমি পারতপক্ষে তোমার কাছ ছাড়া হব না। সেই জন্য সাথী বেছে নিলাম সারা জীবনের চলার পথের জন্য।

ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন তো আসবার কথা নয়। দুটি জীবন যে জোড়া লাগল, তা কি ছাড়াছাড়ির জন্য? বৃথা ভয় পেয়ো না। তোমাকে কষ্ট ও দুঃখ আমি জ্ঞানতঃ দেব না। আমার সমস্ত কর্মের মূল তোমাকে সুখী করা। তার জন্য যে কোন ত্যাগ আমাকে করতে হয় করবো।

গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে হবার ব্যাপারে রক্ষা কোর লক্ষ্মীটি। সাধুর কলঙ্কের আর অবধি থাকবে না। ---

Exhibition দেখতে যাওয়া আমার হয়ে ওঠেনি। সময় ও বন্ধুর অভাব ছিল কিছুটা।

মিউজিয়ম আমি দেখেছি অনেকবার। তুমি যদি যেতে চাও – নিয়ে যেতে পারি। এসব কাজে আমার আনন্দ ও উৎসাহ আছে।

-- যা ঠিক করবার ঠিক করে আমাকে জানাবে।

ভালবাসা নিও
ইতি
প্রীতিকুমার

DO NOT COPY

**জ্ঞানের মূলতত্ত্ব** **শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়**

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন চোখ খুলে তাকায়, এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তখন অকস্মাৎ তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নিকটে ও দূরে তার চতুর্দ্দিকে সংখ্যাতীত বিচিত্র বিষয়বস্তু, জড় ও জীব, এবং ঊর্দ্ধে নীলাকাশে অগণিত জ্যোতিষ্করাজি দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়। সে আরও দেখে এসব পদার্থের কতকগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের স্থান পরিবর্তন করে। এগুলি কোথা থেকে এসেছে, কেনই বা এসেছে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। তার এই প্রথম জ্ঞানের অনুভূতি তার কোন স্বকৃত চেষ্টার ফল নয়। এটা প্রকৃতির অযাচিত দান– প্রত্যেক মানব শিশুর পৈত্রিক সম্মতি ও জীবনযাত্রার পথের সম্বল। একে বিজ্ঞানী বা দার্শনিকেরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান বলেন। কারণ তার দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগে এই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই সংযোগ গড়তে হলে আলোকের আবশ্যক; কারণ অন্ধকারে সে কিছুই দেখে না। বিষয়বস্তু থেকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যখন তার চোখে পড়ে, সেখান থেকে তার সংঘাত বেদনা সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রে পরিবাহিত হয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে উপনীত হয়। সেখানে এক অপূর্ব কৌশলে সুগঠিত ও সুসংহত হয়ে তা তার মানসপটে এসে বহির্জগতের বিষয়বস্তুর প্রতিবিম্বরূপে দেখা দেয়। বহির্জগতের বিষয়বস্তুর এই প্রতিবিম্ব তাদের যথাযথ বা অবিকল রূপ ও গঠন কিনা এটা কোন বিজ্ঞানী বলতে পারে না। এই জাগতিক দৃশ্য যে দেশ ও কালের পটভূমিতে সাজানো, এটাই তার (মানব শিশুর) অনুভূতি হয়। বহির্জগতের ঘটনাবলীর পরম্পরা থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতরূপে সে কালের ধারণা করে। সেরূপ তার দক্ষিণে ও বামে, অগ্রে ও পশ্চাতে এবং উর্দ্ধে ও নিম্নে বিষয়বস্তুর অবস্থান থেকে ত্রৈমাত্রিক দেশের তার ধারণা জন্মে। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানে তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চেষ্টা করে বহির্জগতের বিষয় ও ঘটনা সম্বন্ধে আরও ভাল করে জানবার জন্য। এই থেকেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়বোধের পরস্পর অসংলগ্ন বিষয়বস্তু ও ঘটনা পরম্পরার জ্ঞানকে বুদ্ধি প্রয়োগে পরীক্ষা, প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে বিশ্লেষণপূর্বক বিজ্ঞান জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করেছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে লব্ধ বহির্জগতের বৈচিত্রের মধ্যে বিজ্ঞান করেছে ঐক্যের সন্ধান।

একথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতিশক্তির একটি সীমা আছে। যা কিছু অতি ক্ষুদ্র বা অতি দূরে তা আমরা দেখতে পাই না, বা যা কিছু অতি বিশাল তা ধারণা করতে পারি না। দেশ কালের বিভিন্ন অবস্থায় দৃশ্যবস্তু আমাদের নিকট বিভিন্ন আকারে বা বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সময় বা সায়াহ্নে সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে আমরা একটি বড় রকমের রক্তাভ চাকতির মত দেখি, কিন্তু মধ্যাহ্নে সেই একই সূর্য ঊর্দ্ধাকাশে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অত্যুজ্জল সাদা চাকতির রূপ পরিগ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বিশেষের তৈলচিত্র বা আলোকচিত্রের কিংবা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রের প্রতি তাকিয়ে আমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করে বিশেষ প্রশংসা করি; কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা বিবর্ধনকারী পুরু কাচের (lens) মধ্য দিয়ে তাদের দেখলে আমরা শুধু কতকগুলি বিভিন্ন রং এর এলোমেলো দাগ ভিন্ন আর কিছু দেখতে পাই না। আমাদের শুধু চোখে সূর্যকে চাকার মত দেখি, কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সূর্য হচ্ছে একটি অতিকায় দারুণ উত্তপ্ত ও প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন প্রভৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাথমিক জড় কণিকার বর্ত্তুলাকার প্লাসমা (plasma) পিণ্ড এবং তার চারিদিকে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল পুরু এক জ্বলন্ত বাষ্পের বেষ্টনী। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ দীর্ঘ এবং পৃথিবী থেকে ৯.৩ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। এরূপ প্রকাণ্ড ও বিশাল বস্তু সম্বন্ধে

DO NOT COPY

আমাদের কোন ধারণা হয় না। আমাদের দৃষ্টিশক্তি মাত্র সাত রং এর আলো উপলব্ধি করতে পারে- লাল, কমলা, পীত, হরিৎ, নীল, ঘননীল ও বেগুণী। কিন্তু অন্যান্য বহু আলোকরশ্মি যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুণী আলোকরশ্মি থেকে কম- যথা বেগুণী পারের (ultra violet) আলোকরশ্মি, X রশ্মি, গামা রশ্মি এবং মহা জাগতিক (cosmic) রশ্মি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না; আবার যে সব আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল আলোক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘের চেয়ে কম যথা লালতর (infra-red) আলোকরশ্মি, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (electric waves) এবং রেডিও তরঙ্গ (radio waves) আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তির চোখে এ সকল আলোকরশ্মির উপলব্ধি বা অনুভূতি সম্ভব হত তাহলে আমাদের দৈনন্দিন বহির্জগতের অবয়ব ও রূপ তার নিকট যেত সম্পূর্ণ বদলে। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ বহির্জগৎ বা বিশ্বের অনুভূতি বা জ্ঞান বড়ই অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ এবং এমন কি ভ্রমাত্মক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়ে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের গতিপথ; কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত,- অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী আপন গতিপথে ঘূর্ণায়মান। ফলে, দেখতে পাই যে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে লব্ধজ্ঞান বহির্জগতের স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু ও ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে না, কিংবা এ সবার অস্তিত্বের কারণ ও উৎপত্তির কোন ধারণা দিতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যা আমরা শুধু চোখে দেখি তা তাদের খাঁটি বা সত্যকার রূপ বা অবয়ব নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ তাই একটি খণ্ড বা আপেক্ষিক সত্য, মায়া বা ভেল্কিবাজী। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনেও বহির্জগতকে মায়া, আপাত বাস্তব বা আপেক্ষিক সত্য বলে অভিহিত করেছে।

বুদ্ধি ও যুক্তিবিচার প্রয়োগে মানুষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির এই অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তাকে বলা হয় বিজ্ঞানের পন্থা। এটি বিজ্ঞানীদের স্বকৃত প্রচেষ্টার ফল। বহির্জগতের জড় বস্তুকে তাঁরা বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেছেন তাদের অন্তিম উপাদান রূপে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা। বহির্জগতের যে শক্তি অহরহ ক্রিয়াশীল তাকে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছেন তেজ বা আলোকরূপে, তাপরূপে, বিদ্যুতরূপে, চুম্বকরূপে ও যান্ত্রিকরূপে। বিজ্ঞানের মতে তাই জড় ও শক্তি মিলে গড়ে তুলেছে এই দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পরস্পর রূপান্তর। শুধু তাই নয়, শক্তি এবং জড় কণিকার মধ্যেও করেছে এই রূপান্তরের আবিষ্কার। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, অবস্থা বিশেষে কণিকাধর্মী জড় পদার্থের তরঙ্গধর্মী শক্তিতে পরিণতি ঘটে; অপরপক্ষে, তরঙ্গধর্মী শক্তি জড় কণিকার রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে। এই কণিকারূপী তেজ শক্তিকে ফোটন (photon) বলা হয়। জড় ও শক্তির এই বিনিময়ের ব্যাপারে দেখা গেছে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড় কণিকা বা পরমাণু রূপান্তরিত হয়ে অপরিমিত শক্তির সৃষ্টি করতে পারে। এই বিনিময়ের সমীকরণ আবিষ্কার করেছেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। এই সমীকরণ হচ্ছে $E$(শক্তি)$=mc^2$ ; m হচ্ছে জড় কণিকার ভর(mass); c=আলোকের গতিবেগ(velocity of light)। একথা অনেকে জানেন যে, প্রতি সেকেন্ডে আলোক তরঙ্গ ১,৮৬,৩২৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায় অতিক্ষুদ্র জড় কণিকা ভেঙ্গে প্রভূত পরিমাণ শক্তির উৎপত্তি ঘটতে পারে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে পরমাণু বোমার আবিষ্কারে। আধুনিক বিজ্ঞানের এইসব বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞানকে ভিত্তি করে মানুষ তার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তুলেছে অভাবনীয়রূপে। সে আবিষ্কার

করেছে বিশ্বের বা বহির্জগতের এক নূতন রূপ। বিজ্ঞানের এই বিশ্বরূপের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে যে অচল অটল হিমালয় পর্বত আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তে উহা হচ্ছে সংখ্যাতীত জড়াণু ও জড় পরমাণুর বিস্তৃতদেশ জুড়ে অহরহ ছুটোছুটি। এক টুকরো কঠিন প্রস্তর খণ্ডের বেলাও এ কথা খাটে। আমরা যা শুধু চোখে কঠিন পদার্থ বলি তা আসলে অসংখ্য রন্ধ্রপূর্ণ ও কোটী কোটী প্রচণ্ড বেগে চলন্ত জড় কণিকার আধার। সুতরাং আমাদের চোখের দেখার জগত আর বিজ্ঞানের জগতের মধ্যে দেখা যায় আকাশ পাতাল তফাৎ। অধিকন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও শক্তির ভেদাভেদ ঘুচে যাওয়ায় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে এই বিশ্বজগৎ হচ্ছে এক বিরাট মহাশক্তির ক্রীড়াভূমি- বিজ্ঞানের ভাষায় অসীম দেশকালব্যাপী এটি একটি তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্র (Electro-magnetic field)। এটা সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়াশক্তির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এই জ্ঞানকে মানুষের আপন বুদ্ধি প্রয়োগে উপার্জ্জিত জ্ঞান বলা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৈচিত্রের মধ্যে বিজ্ঞান এই ঐক্যের সন্ধান পেয়েছে। বিশ্বরহস্যের সমাধানের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার মূলে রয়েছে কার্যকারণ শৃঙ্খলার নিয়মের (law of causality) ধারণা। কিন্তু এই কার্যকারণের শৃঙ্খলার নিয়মের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান প্রথম বা আদি কারণের তথা অন্তিম পরিণামের কোন সন্ধান দিতে পারে না। বীজ থেকে গাছের উৎপত্তি হয়, গাছ থেকে পরিণামে বীজ হয়, একথা সকলেই জানে। কিন্তু গাছের কারণ বীজ, না বীজের কারন গাছ- বিজ্ঞানে বা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে এর কোন মীমাংসা হয় না। সুতরাং দেখা যায়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে মানুষ আপন চেষ্টায় যে জ্ঞানের আহরণ করে তাকেও সম্পূর্ণ ও নির্ভুল বলা যায় না। ফলে, বৈজ্ঞানিক সত্যও অপূর্ণ বা আপেক্ষিক। বিজ্ঞানকে তাই সাধারণতঃ বলা হয় সতত অপসৃয়মাণ অখণ্ড সত্য বা সামগ্রিক জ্ঞানের জন্য বিরাম বিহীন সাধনা বা সন্ধান। কেননা, বৈজ্ঞানিক সত্য পরিবর্তনশীল এবং সতত পরিশোধিত হচ্ছে। তাই মানতে হয় বিজ্ঞানের অনুশীলনে বা সাধনায় পূর্ণ সত্য বা সামগ্রিক জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। যেহেতু, মানুষের বুদ্ধিরও একটি সীমা আছে, অসীমের ধারণা তার বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শরৎকালের রাত্রিতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত অবধি বিস্তৃত যে ছায়াপথ(galaxy)দেখি তাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যন্ত্রযোগে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আমাদের সূর্য ও তার অনুরূপ দশহাজার কোটী ($10^{10}$) নক্ষত্র বিরাজিত আছে। এ প্রকার কোটী কোটী ছায়াপথ রয়েছে অসীম আকাশ জুড়ে। এইসব নক্ষত্রের পরস্পর মধ্যবর্তী প্রদেশে আবার ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নীহারিকা বা নক্ষত্র সৃষ্টির মাল মশলা। আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্রই যা শুধু চোখে আমরা দেখি এক একটি আকারে সূর্যের সমান বা তা থেকেও বড়। এ থেকেই সহজে বোঝা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড এবং তার ধারণা করতে গেলে মানুষের বুদ্ধি বিচার বা জ্ঞান কোন কূল কিনারা পায় না। এ প্রসঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কথায় বলা যায় যে নুনের পুতুল গিয়েছিল সাগর মাপতে, সাগরে নামামাত্রই সে সাগরজলে গুলিয়ে একাকার হয়ে গেল। অসীমের ধারণা করতে গেলে বিজ্ঞানীদেরও অনুরূপ অবস্থা ঘটে।

বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াসের ফলে বিজ্ঞানীরা এখন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আমাদের বহির্জগত একটি সর্বব্যাপী বিদ্যুতচুম্বক শক্তির ক্ষেত্র (Electro-magnetic field) থেকে উদ্ভূত হয়েছে; সাধারণের ভাষায় এই ক্ষেত্রকে মহাকাশ বা শূন্যাকাশ(space)বলা হয়। এই তড়িৎক্ষেত্র বা মহাকাশের(space) প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা নির্দ্দেশ করেন একমাত্র গণিতাঙ্কের

DO NOT COPY

সমীকরণে কতকগুলি সাঙ্কেতিক ধ্রুবকের (constants) সাহায্যে- যথা, C=আলোকের গতির ধ্রুবক, g=মহাকর্ষের ধ্রুবক, h=প্লাঙ্কের ধ্রুবক ইত্যাদি।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত আলোকরশ্মি অবস্থা বিশেষে তরঙ্গধর্ম্মী এবং জড়কণিকা রূপে চলাচল করতে পারে। আলোকশক্তি যখন তরঙ্গরূপে চলাচল করে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে কিসের তরঙ্গ? এর উত্তরে এক সময়ে বিজ্ঞানীরা বস্তুভরহীন, সর্বব্যাপী কিম্ভুতকিমাকার ঈথার(Ether) নামক পদার্থের অস্তিত্বের ধারণা করেছিলেন। বর্ত্তমানে এই ঈথার(Ether) পদার্থটিকে মহাকাশ(space) বা তড়িৎ চুম্বকক্ষেত্র রূপে পরিগণিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান এখানে দর্শনের রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। সুতরাং বিজ্ঞানীদের বিশ্বচিত্র এখন একপ্রকার শূন্যে মিলিয়ে গেছে। বেদান্তের মায়া বা সাংখ্যের প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের এই শক্তিক্ষেত্রের তুলনা করা চলে।

সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনে মহাশূন্যকে(space)বলা হয়েছে আকাশ। এই আকাশের দুই প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয়েছে- (১)কারণাকাশ বা পুরাণাং খম্(non-atomic), (২) কার্য্যাকাশ বা বায়ুরং খম্,(Atomic)। কারণাকাশ হচ্ছে সর্বব্যাপী, গতিহীন, সর্বত্রধর্মী, সর্বগম্য শক্তি=তরঙ্গের ক্ষেত্র বা বাহক। এই কারণাকাশকে বিজ্ঞানীদের ঈথারের(Ether)সঙ্গে তুলনা করা যায়; একেই মহাশূন্য বা মহাকাশ অর্থাৎ অবকাশ(space)বলা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের তড়িৎ চুম্বকক্ষেত্রের ধারণার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। অপরপক্ষে, কারণাকাশ থেকে উদ্ভুত কার্য্যাকাশ হচ্ছে প্রাথমিক জড় কণিকার সূক্ষ্মাবয়ব(আকাশ তন্মাত্র)। এই আকাশ তন্মাত্র পরস্পর জড়ীভূত হয়ে অন্যান্য প্রাথমিক সূক্ষ্ম জড়কণিকার তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত)সৃষ্টি করে। শক্তি ক্ষেত্র বা মহাশূন্য থেকে সূক্ষ্ম জড়কণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের এই মতবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানী হয়েলের (Hoyle) প্রবর্তিত আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্ববাদের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়।

আমরা এখন দেখতে পাই যে আমাদের বিশ্ব বা বহির্জগত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দুটি প্রশস্ত পথ আছেঃ ১) আমাদের ইন্দ্রিয় বোধ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি, ২) আমাদের বিচার বুদ্ধি ও বুদ্ধিকৌশল। প্রথম পথে আমরা জন্ম থেকেই দেশকালের পটভূমিতে বহির্জগতের বৈচিত্রের (বিচিত্র বস্তু ও ঘটনা পরম্পরা) অভিজ্ঞতা লাভ করি আমাদের স্বকৃত কোন প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে। এটা আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের সংস্পর্শে এলেই এই জ্ঞানের উৎপত্তি। যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ জ্ঞানের এই বিশ্বচিত্র বুদ্ধিবিচার প্রয়োগে বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ, বিধিবব্ধ ও সমষ্টিবদ্ধ করবার চেষ্টা করি তখন আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হই। এটা হলো বিজ্ঞান বা বুদ্ধির পথ। এই বুদ্ধিবিচার প্রয়োগের মূলে রয়েছে একটি সার্বজনীন বিশ্বাস- প্রকৃতির রাজ্য হচ্ছে একটি নিয়মের রাজ্য। এই নিয়মের গোড়ায় রয়েছে কার্যকারণ ত্তত্ব(law of causality) এবং প্রাকৃতিক ঐক্যানুবর্তিতা(law of uniformity of nature)-ঋত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও প্রমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের বিশ্বচিত্র হচ্ছে অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক এবং ভ্রমাত্মক। এটাও দেখা গেছে যে, বুদ্ধিবিচার প্রয়োগে লব্ধ বিজ্ঞানের বিশ্বচিত্রের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ দৈনন্দিন বিশ্বজগতের কোন সাদৃশ্য নাই এবং বিজ্ঞানের এই বিশ্বচিত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, অর্থাৎ আমাদের চর্ম চোখে দেখা যায় না, এমনকি মানসচোখেরও অগোচর। যদিও আমাদের বুদ্ধিনির্মানের এই বৈজ্ঞানিক জগৎচিত্র গড়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়বোধের জগতকে ভিত্তি করে, তথাপি পরিণামে এটা কেবলমাত্র গণিতবিদ্যার একটি সমস্যাপূরণরূপে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের জগতের মত বিজ্ঞানের এই অতীন্দ্রিয় জগতচিত্রও পূর্ণ বা নিরপেক্ষ নয়। বাস্তবের (Absolute Reality) বা সামগ্রিক জ্ঞানের (Perfect knowledge) বা অখণ্ড সত্যের (Absolute Truth) স্বরূপ নির্ণয় এর সাধ্যায়ত্ত নয়। কেননা, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা তত্ত্বের আদি শৃঙ্খলের কোন নির্দেশ এটি দিতে পারে না, অথবা প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম রক্ষার কর্ত্তাই বা কে, এরও কোন উত্তর দিতে পারে না। অতএব দেখা যায় যে, বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগলব্ধ বিজ্ঞানের জ্ঞানও আপেক্ষিক, অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিময়। ইহার কারণ ইন্দ্রিয়বোধের মত আমাদের বিচার বুদ্ধিরও একটি সীমা আছে। দেশ ও কালের পরপারে অসীমের রাজ্যে প্রবেশ এর সাধ্যায়ত্ত নয়, ইহা পূর্বেই বলা হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানে শক্তির প্রকারভেদের আলোচনায় অথবা সামগ্রিক জ্ঞান কিংবা বিশ্বের প্রকৃত বাস্তব স্বরূপ নির্ণয়ের ও পূর্ণ সত্যের উপলব্ধির প্রচেষ্টায় চেতনার কোন স্থান নেই। জড়কণিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট শক্তিকণিকা বা শক্তি তরঙ্গ নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে, বিশেষতঃ সাংখ্য ও বেদান্তে বিশ্বের বাস্তব স্বরূপ ও সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে যে অপূর্ব সুসংগত ও সারগর্ভ প্রকল্প আছে তাতে এক সর্বব্যাপী চেতনা শক্তি বিশ্বের আদি ও মূল কারণ বা তার বাস্তব স্বরূপ হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। এই বিশ্ব চেতনারই অন্য নাম সামগ্রিক জ্ঞান, নিরাপেক্ষিক বা অখণ্ড সত্য। বেদান্তে একেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ রূপম্ অমৃতং যৎ বিভাতি। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। তার আদি নাই, অন্ত নাই। ব্রহ্মকে জানলেই তাই আর কিছু জানবার বাকি থাকে না। এই জ্ঞানস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম পরম আনন্দের আধার। আগেই বলা হয়েছে, সামগ্রিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্যও নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও বুদ্ধির একটি সীমা আছে। অসীমের বা অনন্তের রাজ্যে এদের দৃষ্টি চলে না। তাই আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বের বাস্তবস্বরূপ বা ব্রহ্মকে বলা হয়েছে অবাঙমনসোগোচরঃ। কিন্তু স্বজ্ঞা বা প্রজ্ঞার (intuition) মাধ্যমে মানুষ এই ব্রহ্মের বা সামগ্রিক জ্ঞানের আভাস পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'আমি আছি' অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব, এই সত্যটি মানুষমাত্রেই বিনা তর্ক পরীক্ষা বা প্রমাণে মেনে নেয়। সেরূপ বিশ্বজগতের অস্তিত্বও একটি সার্বভৌমিক সত্য বা বিশ্বাস। শাস্ত্রে আছে যোগীপুরুষেরা তাদের সমাধি অবস্থায় এই সামগ্রিক জ্ঞান বা ব্রহ্মের রসাস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করেন। প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞাকে পরমাত্মা ও জগতের মধ্যে বা বিশ্বের বাস্তবস্বরূপ ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধমূলক জ্ঞান বলা হয়। তাই একে অনেকে বিশ্বাত্মার বানী বা ভগবতবানী বলে অভিহিত করেন। মহাত্মা গান্ধী একে "inner voice" (অন্তর দেবতার বানী) বলতেন । জার্মান দার্শনিক কান্টের "Categorical imperative" (নিরাপেক্ষিক অপরিহার্য আদেশ) কে এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অনুসরণ করে দেশকালের পটভূমিতে আমরা জাগতিক বিষয় বৈচিত্রে ও জাগতিক ব্যাপার বা ঘটনা পরম্পরায় জ্ঞানের উপলব্ধি করি; আমাদের বুদ্ধিবিচার প্রয়োগ করে আমরা জ্ঞাতা বা মানুষের মনকে জানতে পারি; কিন্তু স্বজ্ঞা বা প্রজ্ঞার অনুসরণ করে আমরা বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার অথবা বিশ্বের বাস্তবস্বরূপ বা সামগ্রিক জ্ঞান ও অখণ্ড সত্যের আভাস পেতে পারি। সুতরাং বলা যায় যে আমাদের সীমাত্মক বুদ্ধির গড়া বিজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করে সামগ্রিক জ্ঞান বা নিরাপেক্ষিক সত্য অথবা বাস্তবের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞার মাধ্যমে ধর্মবুদ্ধির প্রেরণা, যার উদ্বোধনের জন্য প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ও ভগবদগীতায় ত্রিবিধ পন্থার ব্যবস্থা ও সুন্দর বর্ণনা আছে। এ সব পন্থা যথাক্রমে (১) জ্ঞানযোগ (পরাজ্ঞান

বা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন), (২) কর্মযোগ (সর্বভূতের মঙ্গলের জন্য নিষ্কাম কর্ম), (৩) ভক্তিযোগ( সামগ্রিক জ্ঞান বা নিরাপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা)। জ্ঞানকে ভাবে যখন পরিপাক করা হয়, তখন আমাদের কর্ম করবার ইচ্ছার উদ্রেক হয় এবং নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধার অভাবে জ্ঞানলাভ বা কর্ম ফলদায়ক হতে পারে না। ইহাই হল তিনটি বিভিন্ন যোগের মূলতত্ব।

যাঁরা এই তিনটি পন্থার অনুশীলন করেন আমাদের শাস্ত্রে তাঁদের বলা হয়েছে যোগীপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পরমযোগী। তিনি একাধারে ছিলেন জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত। সুতরাং বলা যায়, সামগ্রিক জ্ঞান এবং নিরাপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বা গীতার ভাষায় তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।



## লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অলৌকিকত্ব ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী পুরুষ হচ্ছেন বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি প্রায় দেড়শ বছর নরদেহে লীলা করে গেছেন। তাঁর জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনার খবরাখবর পাওয়া গেছে। এই লেখাটিতে তার কিছু পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে এসেছে এক পাগল। উন্মাদ বললেও কোনোরকম অত্যুক্তি হবে না। নগ্ন অবস্থায় পথে-প্রান্তরে এবং নদীর তীরে ঘুরে বেড়ায়।

মেঘনা নদীর বড় বড় ঢেউ-এর সঙ্গে তার মিতালী। আর তার বন্ধুত্ব উদার অসীম দিগন্ত বিস্তৃত হরিৎ ক্ষেতের সঙ্গে। অসীম আকাশও কখনো কখনো হাতছানি দিয়ে দাকে এই উন্মাদকে। সে তখন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নীলাকাশের দিকে।

লোকালয়ে মাঝে মাঝে আনাগোনা হয় এই উন্মাদের। ছোট ছোট ছেলেরা এর পেছনে লাগে। তখন উন্মাদ দু'হাত ভরে পেচ্ছাব নিয়ে ছুঁড়ে দেয় ছেলেদের গায়ে।

কখনো কখনো এই উন্মাদকে দেখা যায় স্নানের ঘাটে। মেয়েরা স্নান করে আর পাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে।

কেউ তাড়া করলে সে পালিয়ে যায় নিকটবর্তী ঝোপঝাড়ের আড়ালে। সেখানে গিয়ে হাহা রবে অট্টহাসি হাসতে থাকে।

বারদী গ্রামে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এক জায়গায় বসে যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করছিলো। সূত্রগুলি হঠাৎ এক জটিল বন্ধনে জড়িয়ে গেলো। তারা অনেক চেষ্টা করেও সে বন্ধন খুলতে পারল না।

এমন সময় সেই উন্মাদবৎ সন্ন্যাসী তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো। আচার-বিচার-শূন্য ইতস্ততঃ বিচরণকারী পাগলকে কাছে আসতে দেখে শঙ্কিত হল ব্রাহ্মণেরা। ভাবলে, এ কোন জাতের মানুষ কে জানে। এখুনি যদি আমাদের স্পর্শ করে তাহলে জাত যাবে।

ব্রাহ্মণেরা মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি বধ করতে লাগলো। তারা পৈতের দিকে না তাকিয়ে অনিমেষ লোচনে উন্মাদ সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

উন্মাদ তাদের কাছে এসে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলে, পৈতের প্যাঁচ কি করে খুলতে হয় গো?

কেন? গায়ত্রী জপ করে। উত্তর দেয় ব্রাহ্মণরা। উন্মাদ সন্ন্যাসী এক গাল হেসে বলে উঠলো, তবে তা করছ না কেন?

DO NOT COPY

ব্রাহ্মণেরা এবার কৌতূহলী হয়ে পাগলের দিকে তাকাল। তার মধ্যে কি শক্তি লীলা করছে তা তারা জানতে পারলে না। তবে তাদের মধ্যে কারো মনে এমন ভাব জাগল যে তার দ্বারা সে ভাবলে, এই পাগল সাধারণ মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হবেন। তাই সে উন্মাদ সন্ন্যাসীকে অনুরোধ জানালে, তুমি এটি খুলে দাও না কেন!

এবার উন্মাদ সোৎসাহে আরও এগিয়ে এলো ব্রাহ্মণদের কাছে। পৈতের উপর হাত রেখে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে। তারপর একটা হাততালি দিয়ে পৈতের দুই প্রান্ত ধরে আকর্ষণ করা মাত্র হঠাৎ জটিল গ্রন্থি শিথিল হয়ে গিয়ে খুলে গেলো। ব্রাহ্মণেরা অবাক হয়ে গেলো উন্মাদের এই প্রকার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে। তখন তারা সকলে ঘিরে ধরলে পাগলকে, তার আসল পরিচয় জানবার জন্যে।

কিন্তু পাগলের মুখ দিয়ে তারা একটি কথাও বের করতে সক্ষম হল না তার পরিচয় জানার সপক্ষে। পরে অবশ্য তারা অন্যের কাছ থেকে জানতে পারলো পাগলের আসল পরিচয়।

পাগল আর কেউ না। তিনি হচ্ছেন বারদীর ব্রহ্মচারী বা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। এই মহাপুরুষের জীবনে আমরা একাধিকবার বহু অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ লক্ষ্য করেছি।

একবার নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে লোকনাথ ব্রহ্মচারী এলেন ত্রিপুরার দাউদকান্দি গ্রামে। সেখানে একটি বটগাছের ছায়ায় ধ্যানাবিষ্ট হলেন। ঠিক সেই সময় একজন লোক এসে লোকনাথের পা জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলে। তার নাম ভেঙ্গু কর্মকার।

সে বড় বিপদে পড়েছে। ফৌজদারি মামলার আসামী হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছে। বাবাকে ধরেছে যদি তাঁর কৃপায় উদ্ধার হতে পারে ঐ মামলা হতে। বাবা তাকে আশ্বাস দিলেন, যা, তোর মঙ্গল হবে। ঠাকুরের ইচ্ছায় তুই এ-যাত্রা থেকে উদ্ধার পাবি।

সত্যি তাই হলো। দেখতে দেখতে বিপদ-মুক্ত হলো ভেঙ্গু কর্মকার।

* * *

বারদীর জমিদার নাগেরা খুব প্রতিপত্তিশালী। একবার এই নাগ-বাড়ীর এক উচ্ছৃঙ্খল ছেলের সাথে লোকনাথ বাবার এক পশ্চিম দেশীয় শিষ্যের দাঙ্গা হয়। তারপর এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ফৌজদারি মামলা চলতে থাকে।

এই মামলা প্রসঙ্গে লোকনাথজীকে সাক্ষী স্থির করা হলো। তাঁর কাছে আদালতের সমন গেলো, অমুকদিন, অমুক মামলার একজন সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।

লোকনাথজী এলেন আদালতে। তাঁর আর ভয় কি? যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন তাঁর পক্ষে জাগতিক ব্যাপারের তুচ্ছ ঘটনা-দুর্ঘটনা কিছুই নয়। তাঁর চিত্তে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনা।

আদালত লোকে লোকারণ্য। লোকনাথজী কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আপনার বয়েস কত? দেড়শ বছর- উত্তর দিলেন লোকনাথজী।

তাঁর এই কথা শুনে অপর পক্ষের মোক্তার ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সরোষে চেঁচিয়ে উঠলেন, দ্যাখো সাধু, এটা হচ্ছে সরকারী আদালত। এখানে ওরকম ধরণের কথাবার্তা বলা আদৌ চলে না।

লোকনাথজী জবাব দিলেন, তবে তোমাদের যা ইচ্ছে হয় লিখে নাও।

নিজের চোখে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয় এই অতিবৃদ্ধ সাক্ষীর পক্ষে, বিপক্ষের মোক্তার এইটাই তাঁর জেরার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন। তাই তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনার বয়স তো দেড়শ বছর হয়েছে। এই বয়সে দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই বেশি দূর যায় না। অথচ আপনি ঘরের মধ্যে বসে ঘটনাটি কি করে নিজের চোখে দেখলেন?

DO NOT COPY

মোক্তারের কথা শুনে হাসলেন লোকনাথজী। পরে দূরের একটি গাছের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, দ্যাখো তো, ঐ গাছে কোন প্রাণী উঠছে কিনা?

লোকনাথজীর কথা শুনে সকলে তাকিয়ে রইলেন দূরের গাছটির দিকে। তাঁরা কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন লোকনাথজীকে বললেন, কই, কোন প্রাণীই তো নজরে পড়ছে না।

তখন লোকনাথজী কৌতুকভরা হাসি হেসে বললেন, তোমাদের বয়স কম। দৃষ্টিশক্তিও বেশী। অথচ এর কিছুই নজরে পড়ছে না? আমি কিন্তু বেশ দেখছি, সারি সারি লাল পিঁপড়ে গাছটার ওপরে উঠে যাচ্ছে।

লোকনাথজীর কথামতো আদালতে উপস্থিত কয়েকজন মানুষ চলে গেলেন গাছটির কাছে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, সারি সারি লাল পিঁপড়ে গাছটির ওপরে উঠে যাচ্ছে। তখন তাঁরা লোকনাথজীর অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করে বিস্ময় বোধ করলেন। বিপক্ষ পক্ষের মোক্তার আর সাহস পেলেন না লোকনাথজীকে আবোলতাবোল প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করার।

বারদী গ্রামে রয়েছেন লোকনাথজী। তাঁর মাহাত্ম্য ও যোগবিভূতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বহু ধর্মার্থী মানুষ দেখতে আসছেন তাঁকে। একবার ঢাকা থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক দেখতে এলেন লোকনাথজীকে। তাঁরা লোকনাথজীর কথা শুনে এবং মধুর ব্যবহার পেয়ে আনন্দিত হলেন।

সেইসময় প্রখর গ্রীষ্মকাল। চারদিকে আগুনের আঁচের মতো প্রখর সূর্যকিরণ গনগন করছে। ভদ্রলোকেরা ফিরে যাবার সময় এমন ধারা গনগনে রোদ দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। ঐ রোদে যাবেন কি যাবেন না এই ব্যাপারে কিছুটা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। এমন সময় লোকনাথজী বলে উঠলেন, বাবা, তোমরা রওনা হয়ে যাও। রোদের জন্য তোমাদের ভুগতে হবে না। লোকনাথজীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আগন্তুক ভদ্রমণ্ডলী যাত্রা করলেন নিরুদ্বিগ্ন মনে।

দেখতে দেখতে কোথা হতে ম্যাজিকের মতো এক টুকরো মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিলে। প্রখর রৌদ্রতেজ আর রইলো না। তাই লক্ষ্য করে দর্শনার্থীরা বিস্মিত হলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবলেন, এ নিশ্চয় বাবার লীলা। তাঁরা তখন লোকনাথজীর আশ্রমে ফিরে এলেন। লোকনাথজীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন নির্দিষ্ট জায়গায় এই মেঘের আবরণ অপসৃত হবে? আবার পথে বৃষ্টি হবে না তো? তখন আমাদের আবার বিপদে পড়তে হবে।

আগন্তুকদের অহেতুক আশঙ্কা নিবৃত্ত করলেন লোকনাথজী। সোৎসাহে বলে উঠলেন, না, না। বৃষ্টি আসবে না। তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমরা ঢাকার উপকণ্ঠে দয়াগঞ্জ পর্যন্ত গেলে এই মেঘ সরে যাবে। তখন রোদ উঠবে। এবার দর্শনার্থীরা আশ্বস্ত হয়ে নির্বিঘ্নে রওনা হলেন। ঠিক জায়গায় পৌঁছন মাত্র মেঘের স্নিগ্ধ ছায়ার আবরণ গেলো টুটে। তাই লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন আগন্তুকগণ। তাঁরা জগদ্‌গুরু লোকনাথের অলৌকিক কৃপার কথা স্মরণ করে আশাতীত আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। পরে তাঁরা বারদীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। লোকনাথের অপুর্ব ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় লাভ করে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করলেন।

* * *

গৌরগোপাল হচ্ছেন ভোলানন্দ গিরির শিষ্য। তিনি একবার এলেন বারদীতে। উদ্দেশ্য লোকনাথজীকে দর্শন করবেন। তিনি লোকনাথজীর সামনে এসে তাঁকে প্রণাম করে তাঁরই সামনে উপবেশন করলেন। এমন সময় দেখলেন, একজন স্ত্রীলোক এক বাটি দুধ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। লোকনাথজী হঠাৎ বলে উঠলেন, আয়, আয়। এদিকে আয়।
আগন্তুকটি তাঁর কথা শুনে চমকে গেলেন। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, উনি কাকে ডাকছেন?

খানিক পরে একটি বিষধর সাপ এলো তাঁর কাছে। এসেই ল্যাজের কুণ্ডলী পাকিয়ে লোকনাথজীর সামনে ফণা তুলে বসলো।

লোকনাথজী কিন্তু সাপটিকে বসতে দিলেন না একদণ্ড। তিনি ওর ফণাটা ধরে স্ত্রীলোকটির আনা দুধের বাটিতে মুখটা লাগিয়ে দিলেন।

সাপটি গোগ্রাসে খানিকটা দুধ পান করলে। এবার লোকনাথজী সাপটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন যাও। সাপটি চলে গেলো।

লোকনাথজী এবার গৌরগোপালকে ডাকলেন। গৌরগোপাল কাছে আসতেই উনি তার সামনে তুলে ধরলেন দুধের বাটি থেকে খানিকটা দুধ। সেই সঙ্গে বললেন, নিন, প্রসাদ গ্রহণ করুন।

ওঁর কথা শুনে ইতস্তত করতে লাগলেন গৌরগোপাল। ভাবলেন, উনি বলেন কি? এই প্রকার বিষধর সাপের উচ্ছিষ্ট খেতে আদেশ করছেন?

অন্তর্যামী লোকনাথ বুঝতে পারলেন গৌরগোপালের মনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, নে, নে, কোন ভয় নেই। লোকনাথজীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে গৌরগোপাল গ্রহণ করলেন দুধের প্রসাদ।

**একটা মৃত্যুর পর** **সুনন্দন ঘোষ**

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল,
মনের দরজাও ....
টিভির পর্দায় প্রাত্যহিক মৃত্যুর সংখ্যাতত্ব,
দোকানে বাজারে টাটকা সংক্রমণের খবর।
গভীর গভীরতম অন্ধকার বাসা বাঁধছিল বুকের গোপনে।
জানলায় দাঁড়িয়ে গাড়ির বন্ধ ডিকি, গ্যারাজের টানা শাটার,
এমনকি ঘরের বন্ধ আলমারি দেখলেও দম আটকে আসে।
বিজ্ঞরা বলে "ক্লস্ট্রোফোভিয়া,"
আমি তো বুঝি বাকচাতুর্যের আড়ালে ওটা মৃত্যুভয়।

একদিন হঠাৎই ছোট ভাইটাকে নিয়ে গেলো কর্পোরেশনের ঢাকা গাড়ী।
ক্ষুরধার ছেলেটা, যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার সাথে
হাসতে হাসতে বিতর্কে জড়িয়ে যেত,
প্রাণোচ্ছল ছেলেটা, যে সহকর্মীদের সাথে ভাগ করে নিত
শাসন স্নেহ আর ফিশ ফ্রাই,
দীর্ঘদেহী ছেলেটা, যে আমাকে নিরাপদে রাখতো
স্বজনের আঘাত থেকে,
সে চলে গেলো পরিজনহীন প্রান্তরে অচেনা অগ্নিধারীদের হাতে
শরীরটা ছেড়ে দিয়ে,
অগণিত সঙ্গীর চোখের জলে ভিজে।

রাস্তায় নেমে এলাম আবার।
আর সংশয় নেই ঘর থেকে বাইরে পা রাখতে,
সঙ্কোচ নেই বাইরে থেকে ঘরে পা রাখলে।
ঐ একটা মৃত্যু মুছে দিয়েছে প্রতিপলে মৃত্যুর যন্ত্রনা।
মাস্ক থাক, থাক স্যানিটাইজার,
হৃদয় যেন মুখোশে ঢাকা না পড়ে।

DO NOT COPY